বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটদের উন্নয়ন ভূমিকা: বগুড়া জেলার দু'টি ইউনিয়নের একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা

ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ্

Abstract: *The rural Elites of South Asia perform some common economic activities including Bangladesh. The classical economic role of rural Elites of Bangladesh is, nowadays, significantly widened in diversified areas of economic activities to cope up themselves with the social and technological progresses. This evolution in the performances of the rural Elites helps Bangladesh to grow up as a prosperous nation. This paper would show readers the catalystic roles of the rural Elites in adopting modern agricultural technologies, in widening employment opportunities, in poverty alleviation, in disbursement of credit, in gaining Bank and other institutional loan and administrative facilities, in bringing rural people under the structure of cooperatives what were not explored before.*

ভূমিকা

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। আর এ প্রক্রিয়াকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সরকার ও জনগণকে যুগপৎ কাজ করতে হয়। উন্নয়নের মূল শর্তই হলো প্রাগ্রসর ভূমিকা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি কসমেটিক উন্নয়নের যে ধারা বিদ্যমান তা সব সময় সম্পাদিত হয়েছে অস্থায়ী (ad-hoc) ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরের ভিড়ে উন্নয়নের অংশগ্রহণমূলক ধারা এখনো ন্যূনতম অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এর পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান সরকারি কাঠামো, যেমন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে এখনো নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উগ্র প্রতিযোগিতার কারণে আজ পর্যন্ত কোনো সরকার গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টেকসই কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টাও করেনি। তার ওপর যে সকল কাঠামো রয়ে গেছে তার কার্যবিধি, দায়িত্ব পরিধি সম্পর্কে গণমানুষের মাঝে কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনি। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে যথাযথ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। মূলতঃ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে রেখে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারী গ্রামীণ এলিটেরা যথার্থ নেতৃত্ব প্রদানের

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, রাজশাহী

মাধ্যমে যে কোনো ধরনের কর্মসূচীর উন্নয়ন তৎপরতাকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। এ নেতৃত্ব কোনো রকম প্রশিক্ষণ বা সরকারি প্রণোদনায় গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। নেতৃত্ব সৃষ্টি অপেক্ষা গড়ে ওঠা সহজতর। তাই গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করলে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। আর এ ধরনের নেতৃত্বের জন্য স্থানীয় এলাকার গ্রামীণ এলিটেরাই যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। নিজ নিজ এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণে এবং সমাধানের বহুমুখী কৌশল নির্ধারণে তারাই উপযুক্ত নির্দেশক। গ্রামের যে কোনো ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের (সরকারী) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য গ্রামীণ এলিটদের সহযোগিতা অপরিহার্য। মূলত: গ্রাম পর্যায়ে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যে কোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফল রূপকার গ্রামীণ এলিট শ্রেণী। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় প্রভাবশালী হয়ে উঠতে, ক্ষমতার পরিমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করতে গ্রামীণ উন্নয়ন তৎপরতায় এলিটীয় প্রতিযোগিতার যে চিত্র সাম্প্রতিক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে তা মূলতঃ সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করে। ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন গবেষকদের নিকট গ্রামীণ উন্নয়ন তৎপরতায় স্থানীয় এলিটদের ভূমিকার চিত্রায়ন করা সময়ের দাবি বলে বিবেচিত হচ্ছে ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে-

এক. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ (participation) পরীক্ষা করা;

দুই. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা (role) পরীক্ষা করা;

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটির জন্য মূলতঃ সার্ভে বা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়নের প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাকর্ম, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় এলিট শ্রেণীর ভূমিকাকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে বর্তমান গবেষণাকর্মটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের (বিশালপুর ও মির্জাপুর) নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের সাক্ষাৎকার এবং তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।

ক) এলিট, গ্রামীণ এলিট: সংজ্ঞা ও মতবাদ

সতের শতকে কোনো পণ্যের বিশেষ উৎকর্ষকে বিশেষায়িত করবার জন্য 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে উর্ধ্বস্থ কোনো সামাজিক দলকে বোঝানোর জন্য এ

প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে (Bottomore,1964)। ১৯৩০-৩৫ এ ইতালীয় সমাজতাত্ত্বিক ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতাত্ত্বিক লেখার মধ্যে দিয়ে তা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (Pareto,1935)। কোনো সম্প্রদায়ের উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন অধিকতর প্রভাবশালী কোনো দলকে বোঝাতে প্যারেটো এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্যারেটো তাদেরকে এলিট বলে গণ্য করেছেন যারা সরকারের ওপর শক্ত প্রভাব খাটাতে পারেন এবং শাসক এলিট এ বিশেষ দলের লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। আর বাকি লোকজন নিয়ে গঠিত শাসক বহির্ভূত এলিট। Bottomore আরো দেখান যে, এলিটীয় দর্শন মার্কসীয় দর্শনের একটি বিপরীত অবস্থা (Bottomore, 1964:7-49)। ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাল মার্কস রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। Mills (1956) তাদেরকে এলিট শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা সমাজের প্রধান প্রধান পদগুলো তাদের অধিকারে রাখেন এবং সে সাথে ক্ষমতা, সম্পদ ও জনপ্রিয়তা ভোগ করেন (Mills, 1956:13)। তিনি আমেরিকান এলিটের একটি সমীক্ষা থেকে তার উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং দেখান যে, 'ক্ষমতা এলিট' (Power Elite) হলো তা, যা সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গঠিত। তার মতে, ঐ ক্ষমতা এলিটেরা জনগণকে সিদ্ধান্ত দেবার অবস্থান গ্রহণ করেন। আরেকজন খ্যাতিমান এলিট তত্ত্ববিদ Dahl (1963) ক্ষমতা এলিট বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা সমাজের উঁচু শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে । Dahl সমাজের উঁচু শ্রেণী বলতে সে সদস্যদের ইঙ্গিত করেছেন যারা সরকারের কেন্দ্রীয় পদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যারা সরকারের অধিকাংশ নীতি নির্ধারণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সমাজে আধিপত্য প্রকাশে সমর্থ এবং তারা সর্বব্যাপী প্রভাবসম্পন্ন। এলিট তত্ত্বের আরেকদল বিজ্ঞানী (Lasswell, 1952; Kornhauser, 1965) এলিটতত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন- যেমন সমাজ, সমাজ কাঠামো, সমাজ সংগঠন ইত্যাদি । Lasswell (1952) এর মতে, এলিটের সদস্যরা সমাজে উঁচু অবস্থানে থাকেন। প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক Cole (১৯৫৬) এলিট বলতে সে দলকে বোঝান যারা সমাজের প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত করে। Kornhauser (1965) এলিট বলতে সামাজিক কাঠামোতে উঁচু অবস্থান ধারণকারীদের বুঝিয়েছেন। একই দলভুক্ত বিজ্ঞানীদের আরো একজন অনুসারী Anthony Giddens (1973) এ বিষয়ে সামান্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ' এলিট তারাই যারা সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদ দখল করতে পারেন' (Giddens,1973:3-4)।

ওপরে বিশ্লেষিত এলিট সম্পর্কিত অনেক গুণাবলীই একজন গ্রামীণ এলিটের থাকতে পারে। Dube (১৯৫৯) গ্রামীণ এলিট বলতে সেখানকার উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন যারা আর্থিক দিক থেকে অবস্থাসম্পন্ন, মর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষিত এবং যাদের শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে (১৯৫৯:৩৬-১৩৩)।

Sharma (1979) গ্রামীণ এলিট বলতে সে ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়েছেন যারা গ্রাম পর্যায়ে নেতা ও গ্রামের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেন এবং যারা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সমাধান দেন (১৯৭৯:৪৫-১২২) ।

গ্রামীণ এলিট সম্পর্কিত দক্ষিণ এশীয় সমীক্ষাগুলোতে সে লোকদের এলিট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা বিভিন্ন গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে রীতিবদ্ধ অবস্থান দখল করে আছেন। Schulze Ges Blumberg (1957), Bonjean Ges Olson (1964) এবং Jennings (1964) এর অনুসরণে তারা নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তারা ঐতিহ্যিক যশস্বী (Reputational) এলিটবর্গকে তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেননি। যদিও এটা সত্য যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যিক যশ ধরে রাখতে পারছেন না কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, গ্রামীণ ক্ষমতার বেশ খানিকটাই এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। Karim (1979) বাংলাদেশে রাজশাহীর দু'টি গ্রামের ওপর এক গবেষণায় যশস্বী নেতৃত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু তিনি সরকারি কর্মসূচীর ফলে সৃষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি (Karim,1979: 37)। পরবর্তীতে অবশ্য Karim (1983) অন্য গবেষণায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিটদের রীতিবদ্ধ ও অরীতিবদ্ধ উভয় ধরনের এলিটই গ্রাম জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গ্রামকে প্রভাবিত করেন। শ্রীলংকার উদীয়মান এলিটদের ওপর এক সমীক্ষায় Marshall Singer গ্রামীণ এলিট বলতে দলের ভেতর বৌদ্ধ পুরোহিত, ঐতিহ্যিক প্রভাবশালী পরিবার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। Singer আরো বলেন যে, প্রতিটি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ বা দলসমূহ গ্রামীণ এলিটের সদস্য হতে পারেন (Singer, 1964:59)। Singer-এর এ সংজ্ঞাটি থেকে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির বহুমুখীতার জন্য নেতৃত্ব প্রবেষণ সম্ভাবনাও ব্যাপকভাবে বহুমুখী। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিট বলতে গ্রামের নেতৃত্বকে বোঝায়। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের এ গ্রামগুলোতে যারা গ্রামের বিভিন্ন ইস্যুতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তারাই গ্রামীণ এলিট। অবস্থানিক দিক থেকে তাদের কারো যশস্বী এবং কারো অবস্থানিক ভূমিকা থাকতে পারে।

গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণ কৌশল

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের চিহ্নিতকরণ একটি অন্যতম বিষয় । গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে Schulze and Blumberg (1957) দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের চিহ্নিত করেছেন: (১) অবস্থানিক কৌশল (২) যশস্বী কৌশল (Schulze and Blumberg, 1957: 63)

(ক) অবস্থানিক কৌশল (Positional Approach)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter Gi Atlanta City -র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে পরিচিত ছিলো (Floyd Hunter, 1953:37-109)। অবস্থানিক এলিটবর্গ হলেন সে সব লোকজন যারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কর্তৃত্বে অবস্থানিক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানিক এলিটদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানিক এলিট মোট ১২২জন; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬জন, সমবায় সমিতি নেতা ২৩জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১জন , রাজনৈতিক দলের ইউপি পর্যায়ের নেতা ১২জন।

(খ) যশস্বী কৌশল (Reputational Approach)

যশস্বী পদ্ধতি অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনে যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে । এ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন । তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায় । সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter (1953) প্রথম Regional city- তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। যশস্বী পদ্ধতির অনেক কৌশলই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী কৌশল হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যারা সবচাইতে বেশি মূল্য বা Weightage পাবেন তারাই যশস্বী নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim (1990) পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে এবং Harjinder Singh (1976) তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে যশস্বী পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। মূলতঃ এসব প্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় যশস্বী এলিট মোট ৮৮জন।

(গ) ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশল (Issue Participation Approach)

নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে ইস্যু পারটিসিপেশন পদ্ধতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা কর্তৃত্ব করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh (1976) তাঁর পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের চিহ্নিত করতে যশস্বী কৌশলের পাশাপাশি ইস্যু পারটিসিপেশন

কৌশল ব্যবহার করেছেন (করিম, ২০০২:৮৪-৮৫)। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাদেরকে এ পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণা এলাকায় ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিত করা যায়নি।

গ্রামীণ এলিটদের চিহ্নিত করার কৌশল বিশ্লেষণের পর গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায় । তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল (Karim, 1990:38)। তাই বলা যায়, যারা উচ্চ বংশীয় ও স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। গ্রামীণ এসব এলিট নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে, রেডিও শুনে এবং টেলিভিশন দেখে নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। এছাড়াও তারা তাদের সন্তানদের রাজনীতিতে এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে প্রায়শঃই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন, যা গ্রামীণ উন্নয়নের একটি ইতিবাচক দিক বলে বিবেচিত হয়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হবে, যিনি বা যারা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি(বর্গ)।

ভূমিকা (Role)

এ পরিভাষাটি সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি প্রাবরিত (ওভারল্যাপ্ড) কিন্তু একই সময়ে ভিন্ন অর্থে ও প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে ভূমিকা একটি প্রদত্ত 'সামাজিক অবস্থান' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এ সামাজিক অবস্থান এক গুচ্ছ (ক) ব্যক্তিগত গুণ এবং (খ) কার্য দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারে। সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা ভূমিকা পালন বা সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার একটি উপাদান হিসেবে একটি আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে, 'ভূমিকা'কে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রমের ধরনসম্পন্ন পরম্পরা বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

'সামাজিক বিজ্ঞানে প্রায়শঃ কোনো অর্থ নির্ধারণ ব্যতীতই 'ভূমিকা'কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে' (Neiman & Hugher, ১৯৫১: ১৪১-৪৯) । 'ভূমিকা'-র দু'টি সাধারণ ব্যবহার হলো: (ক) সমাজের একক হিসেবে 'ভূমিকা' এবং (খ) সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার অন্য নাম হিসেবে 'ভূমিকা পালন'। প্রথমটি ব্যবহার করেছেন R. Linton এবং দ্বিতীয়

ধারণার উন্নয়ন ঘটান G.H. Mead (Linton, 1936 Ges G.H. Mead, 1934)।

T.R. Sarbin -এর মতে 'ভূমিকা' হলো আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রম বা চুক্তির নির্দিষ্ট ধরনসম্পন্ন পরম্পরা (Lindzey, 1954:223-58)।

জনগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। আর এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত জরুরী (বেগম, ২০০৩:৬৪)। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের কৌশল অতি সম্প্রতি উন্নয়ন সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে (আলম, ২০০৬: ২০৫-২১৭)। আর এই জন অংশগ্রহণে উন্নয়ন প্রচেষ্টার নেতত্বে থাকেন গ্রামীণ এলিট শ্রেণী। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিট শ্রেণী বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখেন।

এক. কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা

ভারতীয় গ্রামীণ এলিটদের ন্যায় (Darshankar,1979:126) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটেরাও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধানতম বাস্তবতা কৃষির উন্নতি হলে রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন। শুধুমাত্র শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ দ্বারা সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । কৃষির উন্নতির ওপর বাংলাদেশের শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। এক কথায় বাংলাদেশের কৃষির উন্নতি এবং দেশের সমৃদ্ধি পরস্পর হতে অবিচ্ছিন্ন। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হওয়ার পরও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় সমস্যা বিরাজমান। এর মধ্যে বর্তমান গবেষণা এলাকায় কৃষির সমস্যার মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে সমস্যা, পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের সংকট, উন্নত বীজের অভাব, উন্নত ধরনের চাষপ্রণালীর সমস্যা, কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধের অপর্যাপ্ততা, প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ না পাওয়ার সমস্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ফসলের বিভিন্ন রোগের সমস্যা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যমান এসব সমস্যা মোকাবেলা করেও স্থানীয় গ্রামীণ এলিটেরা যে কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছেন তা নিম্নের সারণীতে উপস্থাপিত হলো-

সারণী ১.১: কৃষির উন্নয়নে ভূমিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা রাখেন	১৩২ জন	৬৬%
কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা নেই	৪০ জন	২০%
উত্তর প্রদানে বিরত	২৮ জন	১৪%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

সারণী ১.১-এ লক্ষ্য করা যায়, নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ১৩২ জন (৬৬%) কৃষির উন্নতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং সাধ্যমতো কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করতে চেষ্টা করেন। মোট ৪০ জন (২০%) কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই বলে জানান। যদিও দেখা গেছে এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন এবং অনুসারীদের উৎসাহিত করে থাকেন। অবশিষ্ট ২৮জন এলিট (১৪%) এ সংক্রান্ত মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন।

উন্নত জাত এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি উন্নতির জন্য কৃষি ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সংকট কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনেক সময় অনিশ্চিত করে তোলে। কৃষি মৌসুমে নিজ এলাকায় প্রয়োজনীয় সারের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে গ্রামীণ এলিটেরা সংঘবদ্ধ হয়ে অথবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে ক্রমাগত আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে (প্রথম আলো, ২০১৬:১)। গ্রামীণ এলিটেরা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে যথাযথভাবে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবহার কৌশল রপ্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কৃষিতে আধুনিক উপকরণ বলতে প্রধানতঃ আধুনিক সেচ, উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশককে বুঝানো হয়ে থাকে (রহমান, ১৯৯৪: ১৩৯)। বর্তমানে চাষ পদ্ধতিতে কিছু কিছু ধনাত্মক পরিবর্তন যেমন চাষাবাদে পাওয়ার ট্রিলার-ট্রাকটরের ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার, একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন ইত্যাদি লক্ষ্যণীয়। কৃষিতে আধুনিক উপকরণের ব্যাপক ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন গ্রামীণ এলিটেরা। বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। উচ্চ ফলনশীল ইরি ও বিরি (উফশী) ধান চাষকে জনপ্রিয় করে তুলতে গ্রামীণ এলিটেরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। সকলে মিলে একই জাতের ধানের উৎপাদন করলে স্থানীয় বাজারে সে জাতের ধানের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া সম্ভব হয়। অধিকন্তু সরকারিভাবে কোনো বিশেষ প্রজাতির ধান চাষে স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কৃষি বিভাগ পরীক্ষামূলক চাষাবাদ করতে চাইলে তার জন্য প্রয়োজনীয় জমির বরাদ্দ গ্রামীণ এলিটেরাই দিয়ে থাকেন। এছাড়া উন্নত ফলনশীল অন্যান্য ফসল যেমন গম, পাট, আলু, শরিষা, মরিচ, পটল, বেগুনসহ অন্যান্য সবজী উৎপাদনে (বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ) তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অধিকন্তু নিজ নিজ অনুসারীদেরও উন্নতজাতের ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করেন। বহুমুখী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটেরা অর্থনৈতিক সামর্থ্য অব্যাহত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। কারণ অর্থনৈতিক সামর্থ্য সমাজে তাদের মর্যাদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

ষাটের দশকে এ দেশে প্রবর্তিত আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রচলন কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে

আসে (হাকিম, ১৯৯৪:১১৭)। হাকিম (১৯৯৪) দেখিয়েছেন যে, সেচ যন্ত্রসমূহ যদি সরকারি মালিকানায় থাকে, এগুলো যদি কৃষকদের মধ্যে ভাড়ায় সরবরাহ করা হয় এবং এগুলোর সরবরাহ যদি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হয়, তাহলে কেবল সেসব কৃষক এগুলো সংগ্রহ করতে পারবে যাদের সাথে সরবরাহকারী সরকারি সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে বা যারা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের উৎকোচ-উপঢৌকন দিতে পারে। এ ব্যবস্থায় গ্রামের ক্ষমতা কাঠামো নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষিত ও ধনী কৃষকদেরই সেচ যন্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেচ যন্ত্রসমূহ যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তা হলে এগুলো সাধারণতঃ ধনী কৃষকেরাই সংগ্রহ করতে পারেন, কারণ গরীবদের এগুলো কেনার সামর্থ্য নেই। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, গ্রামীণ এলিটেরাই উৎপাদনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটির নিয়ন্ত্রণকারী। বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটেরা গুরুত্বপূর্ণ এ উপকরণটির সাহায্যে কৃষির উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারা নিজেদের জমিতে স্বল্প সময়ে সেচ প্রদান করার মাধ্যমে এবং নিজ নিজ অনুসারীদের সেচ সুবিধা প্রদান করে ফসল উৎপাদনে কার্যকরী ভূমিকা রাখেন, যা দেশের কৃষির প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও বটে। অন্যের জমিতে পানি সেচের জন্য অবশ্য গ্রামীণ এসব এলিট মূল্য নিয়ে থাকেন। তবে প্রয়োজনের সময় যেহেতু জমি সেচ ফসল উৎপাদনের প্রধান শর্ত, সেহেতু সময়মতো সেচ সুবিধা পেতে অনুসারী গ্রামবাসীদের এসব গ্রামীণ এলিটের ওপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমান গবেষণা এলাকার নিরীক্ষিত সকল এলিটই একাধিক সেচ যন্ত্রের মালিক। তাই বলা যায়, সেচ প্রযুক্তির মালিকানার মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ উন্নয়নে নানামাত্রিক ভূমিকা পালন করেন।

দুই. মৎস্য উৎপাদনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন (বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬:৯১)। মৎস্য সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। পুকুরে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান হারে গ্রামীণ এলিটদের অবদানই বেশি। বর্তমান গবেষণা এলাকার বেশিরভাগ পুকুরের মালিকানা গ্রামীণ এলিটদের এবং খাস পুকুরগুলো লীজ নিয়ে তারাই মৎস্য উৎপাদন করে থাকেন। অর্থনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি মাছের পুষ্টির গুরুত্বও অনেক। পুকুরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে গ্রামীণ এলিটেরা যেমন নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে রাখছেন ইতিবাচক ভূমিকা। বর্তমান গবেষণা এলাকায় মৎস্য উৎপাদনের একমাত্র উৎস হলো পুকুর। উন্নত প্রশিক্ষণ লাভের মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য উৎপাদনে তারা নিজেরা যেমন সক্ষমতা দেখিয়েছেন, তেমনি অনুসারীদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে মৎস্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়াও পরিত্যক্ত খাস পুকুর, ডোবা ও জলাশয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে মৎস্য চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অনুসারিদের দ্বারা তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন

করে থাকেন। বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত এসব পুকুরে গ্রামের কিছু সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, মৎস্য উৎপাদনে তাদের নিবিড় ভূমিকায় যেমন তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছেন, তেমনি অনুসারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

তিন. হাঁস-মুরগী পালনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

পশুপালনের ন্যায় হাঁস-মুরগীর পালনেও গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা অনন্য। সুদূর অতীত থেকেই হাঁস-মুরগী পল্লী অঞ্চলের মানুষের সাংসারিক খরচের একটি সম্পূরক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (হামিদ, ১৯৮৮:২৩২)। সনাতন পদ্ধতির হাঁস-মুরগী পালনের পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালনে মুনাফা বেশি হয়। ফলে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগীর পালন দিন দিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হাঁস-মুরগী পালনের সাথে জড়িত লোকসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। অর্থাৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এটি একটি চমৎকার খাতে পরিণত হয়েছে। হাঁস-মুরগী থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রানিজ আমিষ পাওয়া যায়। এ ছাড়া হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাঁস-মুরগীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এমন নানামাত্রিক হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগীর পালন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ছোটো ছোটো খামারভিত্তিক হাঁস-মুরগীর পালন সহজসাধ্য অথচ লাভজনক। গ্রামীণ এলিটেরা সচেতন এবং কিছুটা শিক্ষিত হওয়ায় হাঁস-মুরগী পালনে বেশ সুবিধা করতে পারেন। কারণ হাঁস-মুরগীর বিজ্ঞানসম্মত পালনের পদ্ধতি জানতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। গবেষণা এলাকার অনেক গ্রামীণ এলিটই ঐচ্ছিক পেশা হিসেবে হাঁস-মুরগী পালনকে বেছে নিয়েছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এসব গ্রামীণ এলিটের অনেকেই আবার এ সংক্রান্ত উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিশেষতঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জেলা শাখা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া নিয়মিতভাবেই এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। আগ্রহী গ্রামীণ এলিটেরাও এসব প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ এলিটেরা প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে হাঁস-মুরগী পালনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। ফলে তারা হাঁস-মুরগীর ডিম সংরক্ষণ, বাচ্চা ফুটানোর উপযোগী ডিম নির্বাচন, বাচ্চা উৎপাদন ও ইনকিউবেটর যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এ ছাড়া এসব প্রশিক্ষণে হাঁস-মুরগীর আদর্শ খাদ্য তালিকা, মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় টিকা দান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারেন তারা। তাই তারা প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় অর্থায়নে হাঁস-মুরগী খামার তৈরী করে গবেষণাধীন অঞ্চলে হাঁস-মুরগী পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়াও তারা হাঁস-মুরগী পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রামবাসী বিশেষতঃ নিজস্ব অনুসারীদের উৎসাহিত করে থাকেন। কৃষির ওপর অতি নির্ভরশীলতা

কমিয়ে পোল্ট্রি খামারের প্রতি তাদের এ মনোযোগ তাদের আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়াও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সৃষ্টি হচ্ছে বাড়তি কর্মসংস্থানের। এ খাতকে আরও শক্তিশালী করতে আর্থিক সহযোগিতা, উৎপাদিত মুরগী এবং ডিমের বাজারজাতকরণ এবং ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা এবং সহজে প্রয়োজনীয় টিকা এবং ভ্যাকসিন সরবরাহের জন্য তারা সুপারিশ করেন।

চার. বৃক্ষরোপণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে একটি দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ এলাকায় বনভূমি থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কিন্তু বাংলাদেশের বনভূমি ১১ শতাংশ (স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ফরেস্ট-২০১৬ প্রতিবেদন)। যদিও বন বিভাগের দাবি অনুযায়ী এই পরিমাণ ১৭ শতাংশ (প্রথম আলো, ২০১৬:১)। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির যেমন বিরাট ভূমিকা রয়েছে তেমনি সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। গাছের বহুমাত্রিক উপকারিতা এ পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। স্থানীয় এলাকায় সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচীকে সফল করতে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই হোক আর গ্রাম পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই হোক গ্রামীণ এলিটদের সহযোগিতা তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকন্তু নিজেদের পতিত জমিতে, পুকুরের পাড়ে অথবা ফসলি জমির আইলে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। নিরীক্ষিত এলিটদের অধিকাংশেরই বনজ অথবা ফলজ বাগানের মালিকানা রয়েছে যেখান থেকে তারা সাংসারিক ব্যয়ের বিপরীতে উদ্বৃত্ত আয় করতে সক্ষম হোন।

পাঁচ. গবাদি পশুপালনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

বাংলাদেশে সীমিত আকারে এ খাতটি গড়ে উঠলেও ভবিষ্যতে খাতটিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করলে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হয়। এখানে প্রথাগতভাবে গবাদিপশু চাষাবাদ ও পরিবহণের কাজে এবং হাঁস-মুরগী গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষের সাংসারিক খরচের একটি সম্পূরক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতদসত্ত্বেও এ দেশের অর্থনীতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী খাত একত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। বিনা পুঁজিতে গবাদি পশুপালনে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠী গবাদি পশু বর্গা গ্রহণে বেশি আগ্রহ দেখায়। এর ফলে গ্রামীণ এলিট এবং অনুসারী গ্রামবাসীদের মধ্যে পোষক-পোষ্য (প্যাট্রন-ক্লায়েট) সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

গ্রামীণ এলিটেরা গবাদী পশু পালনে যেসব ভূমিকা পালন করেন তা হলো-

১. গবাদি পশুর খোয়াড় রক্ষনাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা,

২. গবাদি পশু পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুসারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা এবং গবাদী পশু পালনে তাদের উদ্বুদ্ধ করা,

৩. গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গবাদি পশুর রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা,

৪. উন্নত জাতের গবাদি পশু পালনে অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা,

৫. এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করা এবং প্রশিক্ষণ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা ইত্যাদি।

ছয়. সমবায় সমিতি গঠনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

স্বেচ্ছায় একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাই সমবায় (হামিদ, ১৯৮৮:১৫৪)। বাংলার পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগের সূচনা গত শতকের প্রথম দশকে। প্রথম দশকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশের দশকে জিএস দত্ত, তিরিশের দশকে ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এবং চল্লিশের দশকে এইচএএস ইছহাকের মতো ব্যক্তি উদ্যোগের হাত ধরে যে প্রক্রিয়ার সূচনা তা পাকিস্তান আমলে এসে গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন বা ভি-এইড (V-AID) নামে সরকারি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিপুলভাবে যাত্রা শুরু করে (ইসলাম, ২০০৩: ২৩১)। মূলতঃ বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান আইন পাশের মাধ্যমে। ১৯২৯ সালে মহামন্দার সময়ে এর অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হলেও পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর তা আবার জোরদার হয়ে উঠে (হামিদ, ১৯৮৮:১৫৪)। ভি-এইডের অনুষঙ্গ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন থিংক ট্যাংক 'কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'। অনুরূপ আরেকটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় বগুড়া জেলার গবেষণাধীন উপজেলায়। কখনো জার্মানীর 'রাই কেসেন' সমবায় ব্যবস্থার মতো, কখনোবা ডেনমার্কের 'ফোক স্কুল' কাঠামো অনুকরণ করে গঠন করা হয় কৃষক সমবায় সমিতি। কিন্তু যে ধরনের পদ্ধতির অনুকরণে বা অনুসরণে তৈরী হোক না কেন, এ সকল সমবায় সমিতি গঠনের মৌল উদ্দেশ্য ছিলো কৃষি আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষকদের কাছে প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা করা। কিন্তু সুদূর অতীত থেকেই মহাজন নির্ভর অর্থায়ন উৎসটিই কৃষি প্রবৃদ্ধির জন্য নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছিলো। সমবায় সমিতিগুলো এ চক্রভাঙ্গার প্রয়াস চালায়। যদিও উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই সমবায় আন্দোলনকেই একটি চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়তে দেখা যায়।

যদিও সমবায়ের ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে গ্রামীণ এলিটদের দায়ী করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করা হয় কিন্তু কার্যতঃ সমবায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য গ্রামীণ এসব এলিট ব্যতীরেকে অন্য শ্রেণী পেশার মানুষও পাওয়া যায়নি (ইসলাম, ২০০৩:১৮৯)। আবার, আবু ইলিয়াস সরকার বর্ণনা করেছেন, গ্রামের এলিটদের আধিপত্যকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক নয়, এটা গ্রামীণ এলিটদের অদম্য ক্ষমতারও ইঙ্গিত দেয়। গ্রামীণ এলিটেরা কার্যতঃ সরকারি

সম্পদে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে যা কিনা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ন ও গ্রামের পৃষ্ঠপোষকতার ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (সরকার, ১৯৯২:৩৩-৩৯)। কিন্তু বিআরডিবি'র ব্যর্থতার দায়ভার দিয়ে গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা লিপ্সার এ চিত্র উন্মুক্ত করা হলেও অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিআরডিবি'র সীমিত যে কার্যক্রম এখনো পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও গ্রামীণ এলিটদের একচ্ছত্র নেতৃত্ব বিদ্যমান এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমাজ নেতা এবং সমবায় নেতা এক ও অভিন্ন (Karim, 1990:98-120)। এ ছাড়া ইসলাম (২০০৩) মেহের পঞ্চগ্রামের সমবায় নেতৃত্ব চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, একই নেতা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা তিনি চিহ্নিত করেছেন তা হলো, গ্রামীণ এলাকার সনাতন নেতৃবৃন্দই সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করছেন (ইসলাম, ২০০৩:১৮৭-১৯৩)। এছাড়া একই নেতার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান এটাও নিশ্চিত করে যে, বিকল্প উন্নয়ন মডেল বাস্তবায়নে বিকল্প বা নতুন ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা মোটেই অপরিহার্য নয়। প্রয়োজন নতুন বা স্বতন্ত্র ধ্যান ধারণা ও উন্নয়ন মানসিকতা (ইসলাম, ২০০৩:১৯১)। গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে এসব গুণের সমাবেশ ঘটে একমাত্র গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর নেতৃত্বে। তারাই গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের উদ্দীপক হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের মূলমন্ত্র ছড়িয়ে দিতে পারেন। নেতৃত্বের জন্য সংগঠিত জনসমষ্টির সমর্থন প্রয়োজন যা গ্রামীণ নেতৃত্বের অধিকারী গ্রামীণ এলিটদের থাকে। ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ যথেষ্ট ফলপ্রসূতা অর্জন করে। সমবায় নেতৃত্বের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বাবলম্বীতা অর্জনে তাদের ভূমিকা তাই প্রশংসার দাবি রাখে। বর্তমান গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ নেতৃত্বের অধিকারী গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট প্রয়াসে অন্ততঃ সেই সত্যতারই প্রমাণ মেলে।

বর্তমান গবেষণা এলাকায় কুমিল্লা মডেলের 'শেষ বংশধর' হিসেবে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএ (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি) এর অধীনে কেএসএস (কৃষক সমবায় সমিতি) সীমিত পরিসরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচিত মির্জাপুর ইউনিয়নে ৮টি এবং বিশালপুর ইউনিয়নে ১৮টি সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানা যায় কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব সংগঠনের অধিকাংশই অকার্যকর।

বর্তমান গবেষণা এলাকার বিআরডিবি'র পরিচালনায় স্থানীয় এলাকায় কেএসএস তার ভঙ্গুর কাঠামো নিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিলেও এসব সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে, পূর্বোক্ত গবেষকদের (Rumi, 1985; Karim, 1990) ন্যায় এমনটি দাবি করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সমাজ নেতা ও সমবায় নেতা এক ও অভিন্ন (Karim, 1990)-এ পর্যবেক্ষণের কোনো সত্যতা বর্তমান গবেষণা এলাকায় পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায়, কিছু কিছু সমবায় সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও কার্যক্রম নেই বললেই চলে।

তাছাড়া এসব সমবায় সমিতির নেতৃত্ব প্রদানকারী অনেকেই গ্রামীণ এলিট মর্যাদার অধিকারী নয়। এসব সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল যারা এলিট মর্যাদার অধিকারী তারা সীমিত আকারে হলেও স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। বলা যায়, এসব সমবায় সমিতির অস্তিত্ব এসব গ্রামীণ এলিটের কার্যতৎপরতার ওপর নির্ভরশীল। তাদের এ তৎপরতায় কুমিল্লা মডেলের 'শেষ বংশধর' এ সমবায় সমিতিটি সীমিত আকারে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সঞ্চয় সমিতি গঠনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এসব এলিট ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগের মাধ্যমেও যৌথ পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় সমিতি গড়ে তোলেন। এসব সঞ্চয় সমিতির সদস্যদের সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ী চাঁদা প্রদান করতে হয়। সঞ্চয়কৃত পুঁজি থেকেই চাহিদা অনুযায়ী সঞ্চয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণের অনুপাতে সমিতির সদস্যদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে তাদেরকে মাসিক হারে সুদসহ কিস্তি প্রদান করতে হয়। ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সুদ এসব সঞ্চয় সমিতির আয়ের একমাত্র উৎস। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে (সাধারণতঃ বছর শেষে) সমবায় সমিতির সমস্ত হিসাব সম্পন্ন করে সমিতির সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় অথবা সমিতির সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে সমিতি ভেঙ্গে দিয়ে সঞ্চিত পুঁজি এবং লভ্যাংশ সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এসব সমিতি গঠনের উদ্যোগ থেকে শুরু করে সমিতির কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে গ্রামীণ এলিটেরা কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের দৃশ্যমান ভূমিকা হিসেবে এ ধরনের সঞ্চয় সমিতি গঠনকে সাম্প্রতিক প্রবণতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া এ ধরনের সঞ্চয় সমিতির সাথে সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই, নেই কোনো প্রশাসনিক জটিলতা এবং ঋণ আদান-প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতা। অধিকন্তু এসব সঞ্চয় সমিতিতে ঋণ আদায়ের সফলতার হারও শতভাগ। মূলতঃ স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এ ধরনের সংগঠনের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকে। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরী হয়, তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং আপদকালীন সময়ে সহজ শর্তে দ্রুততম সময়ে অর্থ ঋণ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে। ফলে গ্রামীণ মহাজনী ব্যবস্থা অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলা যায়। যদিও এ ধরনের সঞ্চয় সমিতির গঠনকে কেন্দ্র করে দু'একটি ক্ষেত্রে আর্থিক অব্যবস্থাপনা এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে কিন্তু এটাও সত্য যে, এ ধরনের সঞ্চয় সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় তারাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামীণ গঠনে এলিটদের ভূমিকা

যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় গবেষণাধীন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে যুব উন্নয়ন সমবায়

সমিতি গড়ে উঠেছে এবং এতে গ্রামীণ এলিটদের বংশধর যুবক শ্রেণীর নেতৃত্বের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। যুব উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে (মৎস্য, পশুপালন, মুরগীপালন ইত্যাদি) এসব সমিতির সদস্যরা অংশ নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কৌশল রপ্ত করে এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ (যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে আর্থিক ঋণ পাওয়া সাপেক্ষে) করে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করে থাকে। গ্রামীণ যুব শ্রেণীর মধ্যে কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সবোপরি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এনজিও প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

এসব সমিতি সংগঠনের পাশাপাশি কিছু উদ্যমী গ্রামীণ এলিট উপজেলা সমবায় অফিস অথবা সমাজসেবা অফিসের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা (এনজিও) করে স্থানীয় ভিত্তিতে সঞ্চয়ী কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। এসব সংস্থা মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক এনজিও। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এনজিও হওয়ায় স্থানীয় এলাকার অনেকেই একে দরিদ্র শ্রেণী শোষণের নব্য কৌশল বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং সনাতন সুদভিত্তিক মহাজনী ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ হিসেবে গণ্য করতে চান। পুঁজি গঠনের কৌশল তৈরীতে এবং দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব স্থানীয় এনজিও'র কার্যকারিতা নেহায়েত কম নয়। সারণী ১.২ এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে-

সারণী-১.২: সমবায় এবং সঞ্চয় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায় সমিতি ভূমিকা রাখেন	১৩৭ জন	৬৮.৫%
সমবায় সমিতি গঠনে ভূমিকা নেই	৪৭ জন	২৩.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	১৬ জন	৮%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্রঃ মাঠ জরিপ

সারণী ১.২-এ লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ১৩৭ জন (৬৮.৫%) গ্রামীণ এলিট বিভিন্ন সমবায় সমিতি অথবা সঞ্চয় সমিতির সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রধান উদ্যোক্তা। এ ধরনের সমিতি গঠনের মাধ্যমে তারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক

স্বাবলম্বীতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছেন বলে দাবি করেন। সমিতিতে সঞ্চিত অর্থ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিপদের বড় সংগ্রহ হিসেবে গচ্ছিত থাকে। ফলে প্রয়োজনের সময় এসব সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ পাওয়া যায় । তাছাড়া এ ধরনের সমিতি সংগঠনের তৎপরতায় গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে বলে তারা মনে করেন। ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে এসব সমবায় সমিতি। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঐক্যবদ্ধতাও তৈরী হয় যাতে করে তারা আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে। অন্যদিকে ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট সমবায় সমিতি অথবা সঞ্চয় সমিতি গঠনের সাথে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে সুদভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান না। তাদের কেউ কেউ অবশ্য সাংসারিক প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ক্ষেত্র বিশেষে শহরের বড় বড় সুদী মহাজনদের কাছ থেকে গহনা বা জমির দলিল বন্ধকের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন বলে জানা যায়। তবে এটা তারা নিতান্তই সাংসারিক প্রয়োজনে করে থাকেন, সঞ্চয়ের বিলাসিতা থেকে নয় বলে দাবি করেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং রক্ষণশীল মনোভাবের অধিকারী। বাকী ১৬ জন (৮%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন। মূলতঃ এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদের কেউ কেউ বিভিন্ন সমবায় সমিতি অথবা সঞ্চয় সমিতির সাথে জড়িত থাকলেও তারা তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না চাওয়ায় উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

সাত. জমি বর্গাদানের মাধ্যমে দারিদ্যতা দূরিকরণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা এলিটীয় মর্যাদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা জমির মালিকানা যেমন তাদের আর্থিক সচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন করার নিশ্চয়তা দেয় তেমনি তাদের অনুসারীদের দারিদ্র্য দূরিকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে জমি বর্গাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। সারণী-১.৩ এ গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা চিত্রিত করা হলো-

সারণী-১.৩ মালিকানাধীন জমি বর্গাদানের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা নেই	৪০ জন	২০%
উত্তর প্রদানে বিরত	২৮ জন	১৪%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

সারণী ১.৩ এ লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ১৫৯ জন (৭৯.৫%) গ্রামীণ এলিট তাদের জমি বর্গাচাষে দেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা ধনী কৃষক, যারা নিজেরা চাষাবাদ করেন এবং অপরকেও কিছু জমি বর্গাচাষে প্রদান করেন। কোনো কোনো এলিট অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকায় (ব্যবসা অথবা চাকুরি) তাদের সমস্ত জমি বর্গাচাষে প্রদান করেন। বর্গা দেয়ার ক্ষেত্রে এসব গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বর্গাচাষের অর্থনৈতিক গুরুত্বও ব্যাপক। এ অর্থনৈতিক গুরুত্বকে অনুধাবন করেই ১৯৫৩-এর আইনে বর্গাচাষ (ভাগচাষ) প্রথাকে সমর্থন দেয়া হয়। তবে ১৯৮৪ সালের আইনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

(ক) ভাগচাষী ও জমির মালিকের সাথে ন্যূনতম ৫ বছরের জন্য একটি লিখিত চুক্তি থাকবে।

(খ) মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে শস্য বন্টনের নতুন নীতি অনুযায়ী উৎপাদিত ফসলের ১/৩ অংশ মালিক (তার জমির জন্য), ১/৩ অংশ ভাগচাষী (তার শ্রমের জন্য) এবং ১/৩ অংশ উপকরণ সরবরাহকারী (ভাগচাষী কিংবা মালিক যিনিই সরবরাহ করবে) পাবে। যে ক্ষেত্রে সকল উপকরণ মালিক ও ভাগচাষী সমভাবে সরবরাহ করবে, সে ক্ষেত্রে ফসল ৫০:৫০ হিসেবে ভাগ হবে (হামিদ, ১৯৮৮:৩৬-৩৭)। কিন্তু ১৯৮৪ সালের ভাগচাষ সংস্কার আইন জারী হলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করার কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিট ও তাদের অনুসারীরাও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে এখনো আন্তঃসম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় ভাগচাষ চুক্তি মৌখিকভাবে হয়। এখানে ভাগচাষীদের উৎপাদন খরচে গ্রামীণ এলিটেরা কোনো ব্যয় বহন করেন না। বর্তমানে ভাগচাষের চুক্তি অনুযায়ী বর্ষা মৌসুমে (আমন ফসল) মালিক এবং ভাগচাষীদের মধ্যে উৎপাদিত ফসলের ৫০:৫০ ভাগ হয় এবং ইরি-বোরো মৌসুমে বিঘা প্রতি ৩ মন হারে ধান মালিক গ্রামীণ এলিটকে দিতে হয় এবং উৎপাদন খরচ ভাগচাষীকে একাই বহন করতে হয়। যদিও আপাততঃ দৃষ্টিতে এ ধরনের চুক্তিতে ভাগচাষীদের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা খুব কম থাকে তারপরও ভাগচাষ ব্যবস্থায় জমি বর্গা নিতে প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। অধিকন্তু বর্গাচাষ ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি উদ্ভব হওয়ায় ভাগচাষীদের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া যায় না। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী জমি বর্গা নেয়ার পূর্বেই খণ্ডকালীন অথবা বাৎসরিক ফসলের দাম ধরে মালিক পক্ষের প্রাপ্ত অর্থ বর্গাচাষী কর্তৃক পরিশোধ করতে হয়। এতে করে ঐ এক বছর অথবা এক ফসলের যাবতীয় উৎপাদিত ফসলের মালিকানা বর্গাচাষীর হয়। মূলতঃ কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং জমিতে উন্নত বীজ, সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিতে মুনাফা বয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাই বর্গাচাষেও লাভবান হওয়া যাচ্ছে। সুতরাং বলাই যায়, গ্রামীণ এলিটেরা তাদের মালিকানার জমি নিজ অনুসারীদের বর্গাচাষে দিয়ে গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। উত্তরদাতা গ্রামীণ

এলিটদের মধ্যে মোট ৪১ জন (২০.৫%) এলিট নিজেদের জমি বর্গাচাষে দেন না বলে জানিয়েছেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা নিজের মালিকানার সমস্ত জমি নিজেই চাষাবাদ করে থাকেন। তাদের উদ্বৃত্ত জমি না থাকায় জমি বর্গাচাষ দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

আট. কৃষিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটেরা নিজ গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কোনো কোনো গ্রামীণ এলিট কৃষি মৌসুমে আবার কোনো কোনো এলিট সারা বছরব্যাপী সাংসারিক কাজের প্রয়োজনে মাসভিত্তিক অথবা বছরভিত্তিক কাজের লোক নিয়োগ করেন। কাজের লোক নিয়োগের বেতন কাঠামোও খারাপ নয়। অতীতে ৫০০-৭০০ টাকা মাস হিসেবে কৃষি শ্রমিকদের নিয়োগ দেয়া হতো, বর্তমানে তা ৫০০০-৬০০০ টাকায় পৌঁছেছে। এ ছাড়া খোরাকি (বাৎসরিক খাবার খরচ) বাবদ নিয়োগকর্তা এলিটের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাতো থাকেই। তবে কাজের সময়সীমা সকাল ৬টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) আইনের পরিপন্থী। তবে ভরা কৃষি মৌসুমে কাজের চাপ থাকলেও অন্যান্য সময়ে সংসারের টুকটাক কাজ করেই তারা সময় অতিবাহিত করে। মাসভিত্তিক অথবা বছরভিত্তিক লোক নিয়োগ ছাড়াও গ্রামীণ এলিটেরা সাংসারিক এবং কৃষির বিভিন্ন কাজে দিনভিত্তিক অথবা চুক্তিভিত্তিক লোক নিয়োগ করে থাকেন। বিশেষ করে কৃষিতে যখন কাজ থাকে না তখন সাংসারিক নানা প্রয়োজনে তারা দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে শ্রমিকদের কাজ প্রদান করেন। মোট কথা গ্রামীণ এসব এলিট নিজের কৃষি জমিতে লোক নিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন, তেমনি দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখেন।

কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রামীণ এলিট

নিজেদের কৃষি কাজে লোক নিয়োগ ছাড়াও গ্রামীণ এসব এলিট তাদের অনুসারী গ্রামবাসীদের শহরে কোনো বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ দানের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখেন। গ্রামীণ এলিটদের পরিচিত অথবা আত্মীয়দের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় এনজিওসমূহে পিওন অথবা স্বল্প শিক্ষিত অনুসারীদের করনিক কাজে নিয়োগ দিতে তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালান। এছাড়া পরিচিত অথবা আত্মীয়দের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসারীদের মাসভিত্তিক বেতনে চাকুরি পাইয়ে দিতে এলিটদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ গ্রামীণ এলিটদেরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকে (সম্প্রতি এই বিধিমালা বিলুপ্ত করা হয়েছে)। তাই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো পদশূন্য হলে তার বিপরীতে গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ অনুসারীদের নিয়োগ দানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তবে এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক

প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ এলিটেরা নিজ অনুসারীদের নিয়োগ দানের জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে থাকেন এবং প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধা করেন না। মর্যাদার লড়াইয়ে জয়ী হতে এ ধরনের ব্যয় করতে তারা কুণ্ঠিত হন না। কখনো কখনো গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ অনুসারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ছোটো-খাটো ব্যবসা করার জন্য পুঁজি সংগঠনের ব্যবস্থা করে থাকেন। হাট-বাজারে মুদি দোকান-কাঁচা সবজির দোকান প্রতিষ্ঠা এ ধরনের উদ্যোগের মধ্যে থাকে। এ ছাড়াও হাঁস-মুরগীর খামার-নার্সারী প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে অনুসারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

নয়. নিজ এলাকায় হাট-বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পণ্যের বিপণনে এলিটদের ভূমিকা

উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদিত পণ্যের আশানুরূপ মূল্য পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে বিপণন ব্যবস্থার কাঠামো বেশ জটিল। সাধারণভাবে বিপণন বা 'বাজার' বলতে কেনা-বেচাকে বুঝানো হয়। স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করলে পাওয়া যায় প্রাথমিক বাজার। এর মধ্যে দু'রকমের বাজার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এক. গ্রাম্য বাজার যা সাধারণতঃ ১ থেকে ৩ মাইলের মধ্যে দেখা যায়। এ বাজারে প্রায় সব কিছুই খুচরো কেনা-বেচা হয়। প্রতিদিনই এ বাজার বসে। দুই. 'হাট' যা সপ্তাহে ১ বা ২ দিন বসে। এতে খুচরো ও পাইকারী উভয় প্রকারের জিনিসপত্র কেনা-বেচা হয়। এখানে উৎপাদকরা তাদের দ্রব্য-সামগ্রী সরাসরি ভোক্তা ছাড়াও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট বিক্রয় করার সুযোগ পায় (হামিদ, ১৯৮৮:২১৯)। গবেষণা এলাকায় এ ধরনের বাজার-হাট প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ এলিটদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় এবং বাজার-হাটের সম্প্রসারণেও তারা ভূমিকা রাখেন। সাম্প্রতিক অতীতে বিশালপুর ইউনিয়নের জামাইল হাট প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় এলিটদের তৎপরতা ছিলো লক্ষ্যণীয়। মূলতঃ স্থানীয় এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য তারা এ ধরনের হাট-বাজার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে থাকেন। এতে খুচরা ও পাইকারী উভয় প্রকারেরই জিনিস-পত্র কেনা-বেচা হয়। এখানে উৎপাদকরা তাদের দ্রব্য- সামগ্রী সরাসরি ভোক্তা ছাড়াও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট বিক্রয় করার সুযোগ পায়। বেপারী, পাইকার, ফড়িয়াসহ বিভিন্ন রকমের মধ্যস্বত্বভোগীগণ এ হাটে মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে। এসব হাট-বাজার সম্প্রসারণেও গ্রামীণ এলিটেরা ভূমিকা রাখেন।

গবেষণাধীন বিশালপুর ইউনিয়নের কহিতকুল এবং বামিহাল গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান চৌমুহনীতে প্রাত্যহিক বাজার স্থাপনের জন্য উভয় গ্রামের গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। এ বাজার স্থাপিত হলে দূরবর্তী শেরপুর, মির্জাপুর এবং রাণীরহাটের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে বলেই তাদের এ ধরনের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

দশ. সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় ভূমিকা

বাংলাদেশের সার্বিক ভূমি ব্যবস্থায় সরকারি খাস ও দখলযোগ্য জমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণা এলাকায় খাস জমির মধ্যে সার্টিফিকেট প্রথায় প্রাপ্ত জমি, পরিত্যাগ, প্রত্যর্পণ বা বাতিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের ওপর অর্পিত জমি, হাটবাজারসহ অন্য কিছু খাস জমি রয়েছে। সরকারি খাস জমিতে আশ্রয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে তাতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনেও ভূমিকা রাখে গ্রামীণ এসব এলিট। অধিকন্তু গবেষণা এলাকায় যেসব সরকারি সম্পত্তি রয়েছে যেমন হাট-বাজারে প্রতিষ্ঠিত পাকা ঘর, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিল্ডিং, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও সরকারি গাছ-গাছালি সংরক্ষণে গ্রামীণ এলিটেরা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

এগার. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গোষ্ঠী জীবনকে সংরক্ষণের জন্য সমাজ জীবনে পারস্পরিক লেন-দেনের সূচনা ঘটেছিলো। এসব পারস্পরিক লেন-দেন এবং আদান-প্রদান থেকেই গ্রামীণ জীবনে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছে (হোসেন, ২০০৪:১৫৯-১৭৬)। মূলধন সংকট এ দেশের কৃষক সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, ধনী কৃষক ও গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আপদকালীন আর্থিক সচ্ছলতা মোকাবেলা করা এতদঞ্চলে এক চিরায়ত ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ভূমিহীনতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সাথে ঋণগ্রস্থতার সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম গবেষণায় এ ব্যাপারে ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে Mukherjee (1971); Wood (1978); Arens and Van Beurden (1977); Van Schendel (1982) ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সাথে ঋণের সম্পর্কের যোগসূত্র লক্ষ্য করেছেন। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি বন্ধকের বিদ্যমান প্রবণতাকে একটি গবেষণায় (Hussain, 1987) তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার ওপর উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। তবে, গ্রামীণ ঋণের ওপর বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি গবেষণাকর্ম (Socio-economic survey Board, 1956; government of Pakistan, 1962; Registrar of co-operative society, 1967) হয়েছে। এসব গবেষণায় অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এছাড়াও গ্রামীণ পর্যায়ে কিছু নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় (Bertocci, 1970; Arefeen, 1983; Arens and Beurden, 1977; Herbon, 1985; Blanchcet, 1986; Maloney and Ahmed, 1988; Karim, 1990; Mc Gregor, 1992) অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে পল্লী ঋণের উৎসসমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক (হোসেন, ১৯৯৪: ১৬৬; হামিদ, ১৯৮৮)। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়, অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না (Islam, 1985:97)। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, প্রতিবেশী, ধনী ভূ-স্বামী,

দোকানদার, ব্যবসায়ী, গ্রাম্য মহাজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Islam, ১৯৮৫:৯৭; হামিদ, ১৯৮৮)। বাংলাদেশে গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের ভূমিকা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ এখনো প্রধান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

গ্রামীণ সনাতনী অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, যা গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের দিয়ে থাকেন, তা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। ঋণের পরিমাণ কম হোক অন্ততঃ সুদের বোঝা বইতে হয় না। অবশ্য গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় শক্ত অবস্থানের জন্য অথবা ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তারের জন্য এসব ঋণ প্রদান করে থাকেন বলে ধ্রুপদী গবেষকগণ দেখিয়েছেন (Bertocei, 1970, Karim, 1990)। তবে বর্তমান গবেষকের উপলব্ধি হলো, বিনাসুদে দ্রুততম সময়ে, অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় এবং মৌখিক চুক্তিতে এ ঋণ সুবিধা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে তা অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই একে সামাজিক পুঁজি হিসেবেই গণ্য করা উচিৎ (রহমান, ২০০৩:২১-৪২) এবং এ ঋণ প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের মনোভাবের চেয়ে তা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে কী-না সেটাই বিচার্য বিষয়। দিন মজুরদের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা কম। তাই ঋণের জন্যও তাদের নিভ্র করতে হয় তাদের প্রতিপোষকদের অর্থাৎ গ্রামীণ এলিটদের ওপর। অন্যদিকে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্থ ও জমির স্বল্পতার পাশাপাশি ঘন ঘন ফসলহানি এবং ফসলের উৎপাদন খরচের সাথে বিক্রয়মূল্যের সামঞ্জস্যহীনতার কারণে তাদের মধ্যে ঋণগ্রস্থতার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। ফলে এসব প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের যেমন তাদের পৈত্রিক পেশা ধরে রাখতে গ্রামীণ এলিটদের (যারা ধনী কৃষক) কাছ থেকে জমি বর্গা নেয়, তেমনি চাষাবাদের উপকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে গ্রামীণ এলিটদের কাছ থেকে দ্রুততম সময়ে অর্থ ঋণ অথবা উপকরণ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বিশেষতঃ জটিল ব্যাংকিং পদ্ধতি না বোঝায় এবং ব্যাংক ঋণের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তারা যে কোনো ধরনের ঋণের জন্য গ্রামীণ এলিটদের ওপর অধিকমাত্রায় নিভ্র করে থাকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রাধান্যের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে (রহমান, ১৯৯১; হোসেন, ১৯৯৪)। ঋণ ও গ্রাম্য রাজনীতি সংক্রান্ত প্রসঙ্গ কোন্ কোন্ গবেষণায় বিশ্লেষিত হয়েছে। এর মধ্যে Bertocci (1970), Jansen (1987), Maloney and Ahmed (1988), Karim (1990), McGregor (1992) প্রমুখ গবেষকগণ তাঁদের গ্রাম সমাজ সম্পর্কিত গবেষণায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কাঠামোর সাথে গ্রাম রাজনীতির একটি জটিল সম্পর্ক নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জনে ঋণের সম্পর্ক এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বলয় বৃদ্ধির জন্য ঋণদান এবং বর্গায় জমিতে চাষ বা অন্য কোনো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনুসারীদের

সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে থাকেন। এভাবে গ্রামীণ সমাজে এক ধরনের প্রতিপোষক-অনুগত (Patron-Client) সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও নিজেদের অনুসারীদের ঋণ সুবিধা পাইয়ে দিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। জটিল ব্যাংকিং ব্যবস্থা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে আনুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় অনভিজ্ঞ গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা পেতে গ্রামীণ এলিটদের ওপর নির্ভর করে।

সারণী-১.৪ অনুসারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশোধনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগে অনুসারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান	৩৭ জন	১৮.৫%
রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান	২৫ জন	১২.৫%
ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাধান	৫৩ জন	২৬.৫%
ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান	৩৩ জন	১৬.৫%
উত্তর প্রদানে বিরত	৫২ জন	২৬%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

সারণী ১.৪-এ লক্ষ্য করা যায় যে, গবেষিত ২০০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে ১৪৮ জন (৭৪%) গ্রামীণ এলিট তাদের অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ১৪৮ জন (৭৪%) গ্রামীণ এলিটের মধ্যে মোট ৫৩ জন (২৬.৫%) ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে চেষ্টা করে থাকেন যা মতামত প্রদানকারী এলিটদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের অধিকারী (ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার) এবং ঐতিহ্যিক পরিবারের সদস্য হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষও তাদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। বিশেষতঃ এসব গ্রামীণ এলিট ব্যাংকের সাথে নিয়মিত লেন-দেন করায় এবং ঋণ প্রদানের খাত এবং শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় তারা ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করার বেলায় সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বিশেষ সখ্যতা থাকায় তারা এক ধরনের কৌশলে কার্য উদ্ধার করে থাকেন। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে তারা ঘুষ প্রদান করে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন তবে তা আনুষ্ঠানিকভাবে তারা স্বীকার করেননি।

মোট ৩৩ জন (১৬.৫%) গ্রামীণ এলিট অনুসারীদের ঋণ পাইয়ে দিতে ব্যাংক কর্মকর্তা এবং অনুসারীদের মধ্যে ঘুষ লেন-দেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন। ঘুষের একটি নির্ধারিত অংশ তারা পকেটস্থ করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদেরকে অনেকে দালাল বলে চিহ্নিত করে থাকে। মোট ৩৭ জন (১৮.৫%) গ্রামীণ এলিট ব্যাংক ঋণ পাওয়ার শর্তস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন ইউপি চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট, জমির কাগজ-পত্র, ব্যাংকের ফর্ম ইত্যাদি) সংগ্রহে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অনুসারীদের ঋণ পাইয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ শ্রেণীর এলিটদের মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার, বিদ্যালয়-মাদ্রসার শিক্ষক গ্রামীণ এলিট উল্লেখযোগ্য। মোট ২৫ জন (১২.৫%) গ্রামীণ এলিট অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি দলের নেতারা বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারেন। সরকারি বিশেষ বিশেষ ঋণ তাদের পকেটস্ত হয় বলে ব্যাংক থেকে অভিযোগ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এ ধরনের ঋণ তারা নির্ধারিত কাজে ব্যবহার না করে অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করে থাকেন। এ শ্রেণীর এলিটেরা উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের জোরালো সুপারিশের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ উত্তোলন করতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এ জন্য তারা অনুসারীদের কাছ থেকে উৎকোচ-বখশিস গ্রহণ করে থাকেন। অবশিষ্ট ৫২ জন (২৬%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব প্রদানে বিরত থেকেছেন।

গ্রামীণ অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রধান উৎস গ্রামীণ এসব এলিট প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের লেন-দেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। ফলে সরকারি ঋণের সরবরাহ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ঋণ ব্যবহার করতে পারেন। গ্রামীণ এসব এলিট সরকার এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন বলা যায়।

বার. এনজিও এবং গ্রামীণ এলিট

এনজিও ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র পরিসংখ্যান, বক্তব্য-বিবৃতি এবং ঋণ আদায়ের হারের উপস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে চিত্রিত করার যে প্রয়াস তা প্রশ্নাতীত নয়। যখন ঋণের কিস্তি পরিশোধে ঋণ গ্রহীতার সর্বস্ব হারাতে হয়, তখন তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চিত সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এ সমস্ত এনজিও ঋণ প্রদানের টার্গেট ব্যক্তি হিসেবে গ্রামীণ মহিলাদের নির্ধারণ করে যাদের স্পষ্ট কোনো পেশা অথবা উপার্জন অনুপস্থিত। কিন্তু ঋণ গ্রহণের পর ৭ দিনের মাথায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে তাদের মূলধনে হাত দিতে হয় এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে তারা মূলধন হারিয়ে পাগলপ্রায় অবস্থায় ঋণের জাল থেকে মুক্ত হতে গৃহস্থালি জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এতে পারিবারিক জীবনে নেমে আসে অবিশ্বাস, অশান্তি, ঝগড়া, বিবাদ এবং অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদসহ সৃষ্টি হয় নানাবিধ সামাজিক সমস্যার। আর এসব সামাজিক

সমস্যা উত্তরণে এসব এনজিও'র কোনোই ভূমিকা লক্ষ্যণীয় নয়। এমতাবস্থায় এসব এনজিও তাদের প্রদানকৃত ঋণ আদায়ের বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে যেমন বিচার-সালিশ, থানায় মামলার হুমকি ইত্যাদি। এ পর্যায়ে সমাজ জীবনে সৃষ্ট ভয়াবহ এসব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন গ্রামীণ এলিটেরা। স্থানীয় উন্নয়নের মূল এজেন্ট এসব গ্রামীণ এলিটদের উপেক্ষা করে এবং তাদের সম্পৃক্ততাকে এড়িয়ে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। কারণ নিজ নিজ গ্রামের সামাজিক বন্ধনের মূল কেন্দ্রবিন্দু এসব গ্রামীণ এলিট এবং তারাই গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ। তাই এনজিওসমূহের ভেবে দেখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার কথা বলে মুনাফা অর্জন যদি তাদের লক্ষ্য না হয় তবে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সঠিক রোড ম্যাপ বাস্তবায়নে গ্রামীণ এলিটদের সম্পৃক্তকরণ এবং দিক নির্দেশনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন বলে অগ্রসর চিন্তার নাগরিকেরা মনে করেন।

তের: রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামের রাস্তা-ঘাট অথবা অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পল্লী গ্রামীণ অবকাঠামো যেমন রাস্তা, বাঁশের সাঁকো নির্মাণ, নালা/নর্দমা খনন ও পুনঃখননে গ্রামীণ এলিটেরা সমষ্টিগতভাবে কাজ করে থাকেন। গ্রামগুলোতে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ যেমন এর অর্থনীতিতে চাপ তৈরী করেছে তেমনি গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থার ওপরও চাপ তৈরী করেছে। যত্রতত্র ঘর-বাড়ী নির্মাণের ফলে গ্রামের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য রাস্তা-ঘাটের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ছে। তাই পরিকল্পনামাফিক গ্রামের অভ্যন্তরে রাস্তা-ঘাটের পরিকল্পনা এবং তা নির্মাণ ও সংস্কারে গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সরকারী অনুদানের প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের নিরলস ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি নিজেরাও উদ্যোগী হয়ে স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সচলতার জন্য এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও কিছু নীতি পরামর্শ

১. গ্রামীণ অর্থনীতির মূল শক্তি ভূমি। আর অধিকাংশ ভূমির মালিকানা গ্রামীণ এলিটদের হাতে থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতি মূলতঃ তাদের উপরই নিভ্রশীল যা বর্তমান গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং ভূমির সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য গ্রামীণ এলিটদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতি যেমন গতিশীল হবে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষির আধুনিকীকরণের মূল অনুঘটক যে গ্রামীণ এলিট শ্রেণী তা চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহজ শর্তে গ্রামীণ এলিটদের

ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৩. কৃষি ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য দিক যেমন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গ্রামীণ এলিটদের অনবদ্য ভূমিকা চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে নীতি নির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীণ বিপুল জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের এ ভূমিকাকে ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় সংগঠিতকরণ এবং আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের আন্তরিক ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। এক্ষেত্রেও গ্রামীণ এলিটদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫. গ্রামীণ এলিটদের ব্যক্তি পর্যায়ের ভূমিকাকে সংগঠিত করে সমবায়ের আওতায় আনতে পারলে গ্রামীণ উন্নয়নে তা তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা।

উপসংহার

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্রামীণ স্থানীয় এলিটদের ভূমিকার বিশ্লেষণ শেষে এটা নিশ্চিত করে দাবি করা যায়, স্থানীয় গ্রামীণ এলিটদের সক্রিয় এবং কার্মিক অংশগ্রহণ ব্যতীত স্থানীয় পর্যায়ের কোনো উন্নয়ন তৎপরতা এমন কি উন্নয়নের সঠিক রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ সহজ এবং সাবলীল হতে পারে না। স্থানীয় উন্নয়নের প্রকৃত এজেন্ট হিসেবে স্থানীয় এলাকায় উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকারভিত্তিতে তা সম্পন্নকরণে তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে (যৌথ অথবা এককভাবে) তা সম্পূর্ণ করার আন্তরিক প্রয়াসই তাদেরকে স্থানীয় এলাকায় উন্নয়ন এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রামীণ সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তনে তাদের যে ভূমিকা তা বিশ্লেষণের দাবি আজ নতুন করে জোরদার হচ্ছে। তাই দাবি করা যায়, গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা উত্তরণের সাথে সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সফল এবং পরিশীলিত বাস্তবায়ন ঘটাতে সুদীর্ঘকালব্যাপী গ্রামীণ এলিটেরা যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন তাতে যে কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা (সরকারি অথবা বেসরকারি) যুক্ত হলে সত্যিকার অর্থেই গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তখন আত্মনির্ভরশীলতার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন নিজেরাই করতে পারবে। 'গ্রামের উন্নতি হলে বাংলাদেশের উন্নতি হবে' বলে যে দাবি করা হয় তারও বাস্তবায়ন ঘটবে এবং গ্রামীণ উন্নয়নে গণ সম্পৃক্ততার মাত্রা বাড়বে।

তথ্য নির্দেশ

আলম, খুরশিদ (২০০৬) "বাংলাদেশের উন্নয়নে জন-অংশগ্রহণ: একটি পর্যালোচনা," বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঢাকা।

ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল (২০০৩) গ্রামোন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা: মেহের পঞ্চগ্রাম নমুনা বিশ্লেষণ, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।

করিম, এ.এইচ.এম. জেহাদুল (২০০২) "ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গবেষণায় নৃ-বৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহের প্রয়োগ: দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা," এস এম নুরুল ইসলাম (সম্পা.), সমাজ, শরীর ও পরিবেশ নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী, ঢাকা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ সরকার (২০১৬) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ,অর্থ বিভাগ, ঢাকা: অর্থ মণ্ত্রালয়।

বেগম, রহিমা (২০০৩) "রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ," (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস), ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, আতিউর (২০০৩) "সামাজিক পুঁজি ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ," বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বিংশতিতম, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

রহমান, এম ফয়জার (১৯৯৪) "কৃষিতে আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের পরিবেশগত সমস্যা," কাজী তোবারক হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলাদেশের গ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।

সরকার, আবু ইলিয়াস (১৯৯২) "পল্লী উন্নয়নের ত্রুটি ও অসঙ্গতি: একটি মাঠ পর্যায়ের পর্যালোচনা," সমাজ নিরীক্ষণ, ৪৫ সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

"স্টেট অ দ্য ওয়ার্ল্ডস ফরেস্ট-২০১৬ প্রতিবেদন," ঢাকা: প্রথম আলো: ২৬ জুলাই, ২০১৬

হাকিম, এম.এ. (১৯৯৪) "গ্রাম বাংলায় সেচ ব্যবস্থা: উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত," কাজী তোবারক হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলাদেশের গ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।

হামিদ, মুহাম্মদ আবদুল (১৯৮৮) "পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশ," ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স।

হোসেন, মোঃ আনোয়ার (১৯৯৪) "পল্লী ঋণ ব্যবস্থা," কাজী তোবারক হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাঃ), বাংলাদেশের গ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।

Arefeen, H. K. S. (1986) "Changing Agrarian Structure in Banglades- Shimulia: A Study of A Periurban Village," Dhaka: Center for Social Studies.

Arens, J. & Van Beurden, J. (1977) "Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh," Birmingham: Third World Publications.

Bertocci, Peter. J. (1970) "Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan (Unpublished Ph.D. Dissertation)," Michigan: Michigan State University, USA,

Blanchet, Therese (1986) "Rural Women, Saving and Credit: An Anthropological View", Dhaka.

Bonjen, C.M. and Olson, D.M. (1964) Community Leadership: Directions for Research," Administrative Science Quarterly, Vol. IX. No. 3, Dhaka. December

Bottomore, T.B. (1964) "Elites and Society," London: C.A. Watts.

Dahl, Robert A. (1963) "Who Governs," New Haren: Yale University Press.

Darshankar, Ay (1979) "Leadership in Panchayati Raj," Jaipur: Pancheel Prakashan.

Dube, S.S. (1951) "Indian Village," London: Routledge & Kegan Pal.

Giddens, Anthony (1973) "Elites in the British Class Structure," in P. Stansworthy and Anthony Giddens, Elites and Power in British Society, London: Cambridge University Press.

Herbon, D. (1995) "The system of Exchange and Distribution in a Village in Bangladesh," Institute of Rural Development, Gottingen: Geory-August-Universital.

Hunter, Floyd (1953) "Community Power Structure: A Study of Decision Makers," Chapel Hill: The University of Garden Press.

Hussain, Md. Anwar (1987) "Informal Credit Market in a Traditional Society: A Case Study of a Village in Bangladesh" (Unpublished M.Phil. Dissertation), Rajshahi University: IBS.

Islam, Didarul (1985) "Rural Finance,"Dhaka: Apex Publishers.

Jennings, M.K. (1964) "Community Influentials: The Elites of Atlanta," London: The Free Press of Glencoe.

Karim, A.H.M. Zehadul (1979) "Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages," Dhaka: Bangladesh University Grants Commission.

Karim, A.H.M. Zehadul (1983) "Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh," (Unpublished M.A. Thesis) of the Dept. of Anthropology, USA: Syracuse University.

Karim, A.H.M. Zehadul (1990) "The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society," New Delhi: Northern Book Centre.

Kornhauser, William (1965) The Politics of Mass Society, London: Routledge & Kegen Pal.

Lasswell, H.D. et al. (1952) The Comparative Study of Elites, Standford: Hoover Institute.

Linton, R. (1936) The Study of Man, New York: Appleton Century.

Maloney, A.B.S. et al. (1988) Rural Savings and Credit in Bangladesh, Dhaka: University Press Ltd.,

McGregor, J. Allister (1992) Village Credit and Reproduction of Poverty in Contemporary Rural Bangladesh, (paper from the SASE Annual Conference), USA: Irvine California.

Mead, G. H. (1934) Mind, Self and Society, C.W. Morris (ed), Chicago: The University of Chicago Press.

Mills, C. Wright (1956) The Power Elite, New York: McGraw Hill Book Company.

Mukherjee, Ramkrishna (1971) Six Villages of Bengal, Bomby: Popular Prakashan.

Pareto, Vilfredo, (1935) The Mind and Society, New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4.

Rumi, Syed Nasar Ahmed (1985) Rural Elites and their Role in Development: A Case Study in Kustia District (Unpublished M.Phil. Thesis), Rajshahi University: IBS.

Sarbin, T.R. (1954) "Role Theory," G. Lindzey, ed., Hand Book of Social Psychology, Vol.1, Cambridge: Mass: Adison-Wesley.

Schulze, R.O. and L.U. Blumberg (1959) The Determination of Local Power Elites, The American Journal of Sociology, 13 (3),

Sharma, S.S. (1979) Rural Elites in India, Delhi: Sterling Publisher.

Sing, Harjinder (1976) Authority and Influence in two Sikh Villages, New Delhi: Sterling Publisher.

Singer, Marshall, (1964) The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon, Cambridge: The Press.

Socio-Economic Survey Board (1965) Report of the Survey of Rural Credit and Rural Unemployment in East Pakistan, Dhaka: Dhaka University.

Van Schendel, W. (1982) Peasant Mobility: The Odds of life in Rural Bangladesh," New Delhi: Manohar.

Wood, G.D. (1978) "Class Differentiation and Power in Bandokgram: The Minifundist Case," Ameerul Haque (ed.) Exploitation and the Rural Poor, Comilla: BARD, 1978